# একটি অসাধারণ জীবন : স্বামী ত্রিগুণাতীত

অজয় কুমার ভট্টাচার্য

অন্নদামঙ্গল কাব্যে, দেবী অন্নপূর্ণা ঈশ্বরী পাটনীর নৌকায় উঠলে, ''ঈশ্বরীরে জিজ্ঞাসিল ঈশ্বরী পাটনী/ একা দেখি কুলবধূ কে বট আপনি।'' দেবী সরাসরি পরিচয় না দিয়ে হেঁয়ালিতে তাঁর স্বামী শিব সম্বন্ধে বলতে গিয়ে বলেছিলেন, ''অতি বড় বৃদ্ধ পতি সিদ্ধিতে নিপুণ/ কোনো গুণ নাই তার কপালে আগুন।'' শ্রীরামকৃষ্ণ-পার্ষদ সারদাপ্রসন্ন মিত্র বা সারদার কপালে জ্ঞানচক্ষুর অগ্নিসম তেজ ত্রিগুণের আশ্রয় মহামায়ার মায়াশক্তিকে অতিক্রম করতে যথেষ্ট ছিল। তাই সন্ন্যাসের পর তাঁর নাম হল স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ। জন্মেছিলেন সৎ চরিত্রের জন্য সকলের শ্রদ্ধাভাজন শিবকৃষ্ণ মিত্রের ঘর আলো করে। চার পুত্রের দ্বিতীয় সারদা ছেলেবেলা থেকেই ঈশ্বরানুরাগী ও মেধাবী। মেট্রোপলিটন স্কুলে পড়েন, পরীক্ষায় কখনও দ্বিতীয় হন না। এমন ছেলে তাঁর স্কুলের হেডমাস্টার মহেন্দ্রনাথ গুপ্তের চোখ এড়িয়ে যাবেন কী করে! ধরা পড়লেন সেই ছেলেধরা মাস্টারের হাতে। তাঁরই হাত ধরে সারদার শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎ।

ধনীর সন্তান, ঘরের কাজ ঝি-চাকরেরাই করে। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকে আদেশ করলেন, ''কিছু জল এনে আমার পা ধুইয়ে দে।'' সারদা লজ্জায় আরক্তিম; এমন হীন কাজ তিনি করেন কী করে! কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ ছাড়ার পাত্র নন। পুনর্বার আদেশ করায় তাঁকে করতে হল। আর সঙ্গে সঙ্গে সেবার আনন্দে ভেসে গেলেন তিনি। পরবর্তী কালে তাঁর সেবাপরায়ণতার প্রকাশ দেখি যোগানন্দ স্বামীর শেষ অসুখের সময় এবং তারপর শ্রীমায়ের একান্ত সেবকরূপে। এছাড়া সমগ্র জীবনটিই তো মানবসেবায় উৎসর্গীকৃত।

তখনকার দিনে ছোট ছেলেদের হাতে পয়সা দেওয়ার রেওয়াজ ছিল না। দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে বালক সারদা আসবেন কী করে! ঠাকুরই ব্যবস্থা করে দিলেন। একপিঠ হাঁটতে হলেও ফিরে যাওয়ার শেয়ারের গাড়িভাড়া শ্রীমা নহবতের চৌকাঠে রেখে দিতেন। ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি পেল, কিন্তু দীক্ষার জন্য তাঁকে শ্রীমার কাছে পাঠালেন ঠাকুর। বললেন, ''ওরে, অনন্ত রাধার মায়া কহনে না যায়/ কোটি কৃষ্ণ কোটি রাম হয় যায় রয়।'' তবে তখনই দীক্ষা হয়েছিল কি না তা

নিয়ে সংশয় আছে কারণ শ্রীমা যোগানন্দ স্বামীকে তাঁর প্রথম দীক্ষিত সন্তান বলতেন। ঘরে পিতার কঠোর শাসন, মন চাইলেও নিত্য ঠাকুরের কাছে যাওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু ঠাকুর যখন অসুস্থ হয়ে শ্যামপুকুরে ও পরে কাশীপুরে রইলেন, তখন সেই কঠোর শাসন উপেক্ষা করেও মাঝে মাঝে ঠাকুরের সেবায় রাত্রিযাপন করতে লাগলেন সারদা। পুত্রের এই সাধুসঙ্গের ফল বুঝতে পিতা দেরি করলেন না; কারণ সাধুসঙ্গের মোহ না কাটাতে পারলে এ-ছেলেকে ঘরে ফিরে পাওয়ার আশা নেই। তিনি গোপনে ছেলের বিয়ের চেষ্টা করতে লাগলেন। কিন্তু ব্যাপারটা চাপা রইল না। সারদা তা জানতে পেরে একটি চিঠিতে ক্ষমা প্রার্থনা করে বাড়ি থেকে পালালেন। প্রথমে কাশীপুরে, সেখান থেকে পুরীর পথে।

পিতা প্রথমে কাশীপুরে হানা দিলেন। সেখানে ছেলের পুরী যাওয়ার কথা শুনে পুরী গেলেন তাকে ফিরিয়ে আনতে। কিন্তু সারদার পদব্রজে পুরী গমন তাঁকে এক অপরিমেয় ঈশ্বরনির্ভরতা দান করেছিল। যাওয়ার পথে দুদিন না খেয়ে জঙ্গলে পথ হারিয়ে দিশেহারা। একটি গাছের ডালে উঠে রাত্রিযাপন করার উদ্যোগ নিতেই এক কণ্ঠস্বর ভেসে এল—''সন্ন্যাসী ঠাকুর, খিদে পেয়েছে? এই যে বাতাসা রয়েছে, খাও''—বলেই লোকটি কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেল। জল আর বাতাসা খেয়ে প্রাণ ঠান্ডা হল।

ত্রিগুণাতীত এই বালকটির হাত শ্রীরামকৃষ্ণের হাতে দৃঢ়ভাবে আজীবন ধরা ছিল। খেয়ালি বালক শুনলেন অমুক পোড়ো বাড়িতে ভূত আছে। ব্যস, অমাবস্যার অন্ধকার রাতে সেখানে গিয়ে বসে রইলেন। মধ্যরাত্রির পর অন্ধকার ঘরের কোণে এক ক্ষীণ আলো ক্রমে উজ্জ্বল ভীষণ রক্তহিম করা এক বিশাল চোখের রূপ নিয়ে তাঁর দিকে এগিয়ে আসতে লাগল। সে-ভীষণ চোখের দিকে তাকিয়ে যখন তিনি মূর্ছিত হতে চলেছেন তখন নিমেষে ঠাকুর তাঁর হাত ধরে বাইরে এনে বললেন, ''বৎস, যে কাজে মৃত্যু নিশ্চিত, সেসব কাজ বোকার মত কেন কর? আমার প্রতি মন রাখলেই যথেষ্ট হবে।''

এই ঘটনার প্রেক্ষিতে উপদেশটি তাঁর মর্মে গাঁথা হয়ে রইল। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ-সঙ্গের আনন্দ বেশিদিন রইল না। তিনি পার্থিব লীলা সাঙ্গ করলেন। সকলের সঙ্গে সারদাপ্রসন্নও শোকাহত। বাবুরাম মহারাজের মায়ের আমন্ত্রণে নরেন্দ্রর সঙ্গে আঁটপুর গেলেন সবাই। সেখানে সারদা ও গঙ্গাধরকে হরগৌরী সাজিয়ে উৎসব করলেন বালক ভক্তেরা। ২৪ ডিসেম্বরের রাতে ধুনির সামনে শ্রীরামকৃষ্ণকে ঘিরে সঙ্ঘবদ্ধ হওয়া ও সন্ন্যাসের শপথ নেওয়া হল। সেখান থেকে তরুণ তাপসেরা নতুন তেজে দীপ্ত হয়ে ফিরলেন।

বরানগর মঠে স্বামীজী সারদাপ্রসন্নকে আগলাতেন। বাড়ি কাছে, মাঝে মাঝে মা-বাবাকে স্বপ্নে দেখেন। শেষে একদিন মোহিনী মায়ার মূর্তি দেখে মঠে চিঠি লিখে রেখে পালালেন। স্বামীজী তাঁর রাজার ওপর বিরক্ত। বলছেন, ''রাজা আসুক, একবার বকব! কেন তাকে যেতে দিলে?'' সারদা কদিন বাদে ফিরে এলে রাখালরাজ তাঁকে বকছেন : ''কোথায় ছুটে ছুটে বেরিয়ে যাস? এখানে সাধুসঙ্গ! এ ছেড়ে যেতে আছে? আর নরেন্দ্রর মতো লোকের সঙ্গ। এ ছেড়ে কোথায় যাবি?'' ঠাকুর সদাই আগলাচ্ছেন তাঁকে, কখনও স্বামীজীর মধ্য দিয়ে আবার কখনও রাজার মধ্য দিয়ে। একরাত্রে সারদার নির্জন শ্মশানে তন্ত্রসাধনার বাসনা জাগল। বরানগর মঠে সবাই একসঙ্গে শুয়ে আছেন তখন। তিনি উঠে বেরোতে যাবেন এমন সময় রাখাল ঘুমের মধ্যে চেঁচিয়ে উঠলেন : ''ওরে সারদা, যাসনি, যাসনি।'' সবার ঘুম ভেঙে গেল। রাখাল বললেন, ঘুমের মধ্যে ঠাকুর তাঁকে বললেন সারদাকে যেতে বারণ করতে। তন্ত্রসাধনা আর হল

না। সে-আকাঙ্ক্ষা অন্যরূপে প্রকাশ পেল। শুরু করলেন সারা দিনরাত নিরন্তর জপ। ঘুমোন না, খান না; সবাই চিন্তিত হয়ে জোর করতে লাগলেন। সারদা বললেন মহাপুরুষ (তারক) মহারাজ তাঁকে খাওয়ার সময় ছুঁয়ে থাকলে তিনি খেতে পারেন, কারণ সেটি তাঁর কাছে জপের সমান।

বরানগরের সেই দারিদ্র্যকঠোর দিনগুলোয় মঠের ভার লাঘব করতে অনেকেই বেরিয়ে পড়তেন তীর্থভ্রমণে। সারদার তীর্থভ্রমণস্পৃহা তখন প্রবল। স্বামীজী একদিন বললেন, ''পায়ে হেঁটে নবদ্বীপ থেকে বেড়িয়ে এস না, শরৎ।'' কথাটি বেরিয়ে পড়ার ইন্ধন জোগাল সারদাকেও, তাই বেরিয়ে পড়লেন। শরৎ মহারাজ দুপুরে এক জায়গায় বিশ্রাম করতে গিয়ে দেখেন সারদা পুকুরের পাশ থেকে বেরোচ্ছেন। শরৎ মহারাজকে দেখে সারদা বলে উঠলেন, ''দুপুর হয়েছে কিনা তাই স্নান করে পিত্তিরক্ষা করে নিলাম... দেখলুম কচি দূর্বা রয়েছে, তাই খেয়েছি।''

শুধু ঠাকুরের ওপর নির্ভর করে প্রায়শ সারদা মহারাজ পদব্রজে বিভিন্ন তীর্থ দর্শন করেছেন। এমনকী কৈলাস, মানস সরোবর পর্যন্ত। বিপদে আপদে তাঁকে শ্রীরামকৃষ্ণ রক্ষা করেছেন সর্বদা। এক অন্ধকার রাত্রে প্রবল বৃষ্টি, পথচলা দায়। তিনি রাস্তার পাশে কম্বল মুড়ি দিয়ে পড়ে রইলেন। রেল স্টেশনের এক কুলি তাঁকে এই অবস্থায় দেখতে পেয়ে ঘরে নিয়ে যায়। আর একবার এক জ্যোৎস্নারাতে পাহাড়ের খরস্রোতা নদী পেরোচ্ছেন, বাঁধটি স্থানে স্থানে ভাঙা, সেটুকু লাফিয়ে পেরোতে হচ্ছে। হঠাৎ এক কালো মেঘ সব গাঢ় অন্ধকারে ঢেকে দিল। সারদা দাঁড়িয়ে পড়লেন। সহসা শুনলেন কেউ বলছে, ''আমায় অনুসরণ কর।'' তিনি যন্ত্রের মতন চলে ওপারে পৌঁছে গেলেন। তাঁর জীবনে এরকম ঘটনা অজস্র।

স্বামীজী পাশ্চাত্যে বিজয়নিশান উড়িয়েছেন। মঠের ভাইদের কর্মে নামানোর জন্য জ্বলন্ত প্রেরণাপ্রদ চিঠি লিখে চলেছেন। ১৭ জানুয়ারি ১৮৯৬ তাঁকে লিখলেন : ''লোহার দিল চাই, তবে লঙ্কা ডিঙ্গুবি, বজ্র বাঁটুলের মতো হতে হবে, পাহাড় পর্বত ভেদ হয়ে যাতে যায়... তোদের মুখে, হাতে বাগ্‌দেবী বসবেন—ছাতিতে অনন্তবীর্য ভগবান বসবেন—তোরা এমন কাজ করবি যে দুনিয়া তাক হয়ে দেখবে।'' তাঁর প্রাণে সে-আগুন স্পর্শ করল। তিনি একটা প্রেস কিনে একটি পত্রিকা প্রকাশের ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। স্বামীজী খুশি; রাখালকে লিখছেন : ''সারদা কি বাংলা কাগজ বার করবে বলছে। সেটার বিশেষ সাহায্য করবে—সে মতলবটা মন্দ নয়।'' তখনই সম্ভব না হলেও কয়েক বছর পর কাজ শুরু হল। স্বামীজী একহাজার টাকা দিলেন, আরও এক হাজার ধার করা হল। পত্রিকার নাম হল উদ্বোধন। সেযুগে ছাপার কাজ প্রবল পরিশ্রমসাপেক্ষ। কাজের লোক পাওয়া মুশকিল, পেলেও তারা প্রায়ই কাজে আসে না, তাদের ডেকে আনতে হয়। না এলে একা-হাতে কম্পোজ করা, প্রুফ দেখা, ছাপার কাজ, সম্পাদকীয় লেখা, বাড়ি বাড়ি ঘুরে কাগজের আদর্শ বুঝিয়ে গ্রাহক জোগাড় করা এক অমানুষিক পরিশ্রম। খাবার জোটে না, রাতে জ্বর আসে। স্বামীজীর আদর্শে সেই প্রাণপাতী পরিশ্রমের কথা চিরদিন স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে।

ত্রিগুণাতীতানন্দজীর বালকের মতন সহজ আনন্দ ছিল স্বাভাবিকতায় মোড়া। একদিন ডাক্তার বিপিন ঘোষের বাড়ি গেছেন। ডাক্তার পুরনো ভক্ত, ঘরে সাধুকে পেয়ে কী খাবেন জিজ্ঞাসা করায় সাধু বললেন রসগোল্লা। সেই দু-পয়সার রসগোল্লার যুগে তিনি দু-টাকার রসগোল্লা থালায় সাজিয়ে দিলেন আর অম্লানবদনে সাধু সব খেয়ে নিলেন। এইবার ডাক্তারবাবু তাঁর কাছে আসার কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। সাধু বললেন তাঁর পেট খারাপ, তাই রাজা মহারাজ তাঁকে ডাক্তারবাবুর কাছে পাঠিয়েছেন।

ডাক্তারবাবুর বিস্মিত প্রশ্ন, ''অত রসগোল্লা খেলে কেন?'' সাধুর উত্তর, ''তা আপনি দিলেন—আমি কী করব?''

প্রেমানন্দজী বলতেন, ''ওর সিদ্ধাই ছিল। আমি একবার সাড়ে সাত সের ঘন দুধ ধীরে ধীরে দিতে লাগলুম—বেশ খেয়ে যেতে লাগল। আমিও থামলুম না, ও-ও থামল না।'' আবার অন্যদিন বলেছিলেন, ''রোজ একটা করে কলা খেয়ে (সারদা) ওই বেলতলায় সাতদিন পড়ে রইল।'' প্রেমানন্দজীর মা একবার সারদা ও দুজনকে নিমন্ত্রণ করলেন। নির্দিষ্ট দিনে তিনি একা, অপর দুজন অনুপস্থিত। গৃহস্থের জিনিস নষ্ট হওয়ার আশঙ্কায় সারদা তিনজনের খাবার একাই খেয়ে নিলেন। মাতঙ্গিনী দেবীর দুশ্চিন্তা, অসুখ না করে। পরদিন তাঁকে সুস্থ দেখে বলেছিলেন, ''ও অনেক পাহাড়-পর্বত ঘুরে বেড়িয়েছে, ও অনেক 'মোন্তর' শিখেছে, তাই উড়ো মন্তরে উড়িয়ে দেয়। তা না হলে মানুষ কি অত খেতে পারে!''

শ্রীমায়ের সেবায় আছেন তখন; মা বললেন, বেশ ঝাল লঙ্কা কিনে আনতে। তিনি বাগবাজার থেকে বড়বাজার পর্যন্ত লঙ্কা চাখতে চাখতে ঝাল লঙ্কা কিনে আনলেন। ততক্ষণে জিভ ফুলে ঢোল।

তাঁর এই সারল্যভরা বালকত্ব বাইরে, কিন্তু অন্তরে শরীর ও মনের ওপর নিয়ন্ত্রণ অসীম। তাঁর যখন ভগন্দর হল তখন ডাক্তার বললেন, এ-রোগ সারাতে অস্ত্রোপচার আবশ্যক। অজ্ঞান করা হবে শুনে তিনি বললেন, অজ্ঞান করার দরকার নেই, তাঁর কোনও অসুবিধা হবে না। আধ ঘণ্টার ওপর অপারেশন হল প্রায় ছ-ইঞ্চি কেটে, কিন্তু তাঁর মুখে কোনও যন্ত্রণার চিহ্ন দেখা গেল না।

সারদা সম্বন্ধে স্বামীজীর মনোভাব জানতে পারি ব্রহ্মানন্দজীকে লেখা চিঠিতে : ''বাঙ্গলা ভাষায় ম্যাগাজিন Paying করা মুশকিল... সারদা বেচারা একেবারে ভগ্ন মনোরথ হইয়াছে। যে লোকটা এত কাজের এবং নিঃস্বার্থ, তার জন্য যদি ১০০০ টাকা জলেও যায় ক্ষতি কি?'' উদ্বোধন বের হওয়ার পর অমানুষিক পরিশ্রম করতে হত তাঁকে। অর্ধাহার, অনাহারের কষ্ট তো ছিলই, তার সঙ্গে লেখা থেকে শুরু করে তা ছাপানো ও বিতরণ পর্যন্ত সব কাজটি প্রায় তাঁকে একাই সামলাতে হত। দাঁড়িয়ে কাজ করতেন পাছে ঘুম পায়। এই পরিশ্রম সম্বন্ধে স্বামীজী তাঁর শিষ্য শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তীকে বলেছেন, ''তুই বুঝি মনে কচ্ছিস, ঠাকুরের এইসব সন্ন্যাসী সন্তানেরা কেবল গাছতলায় ধুনি জ্বালিয়ে বসে থাকতে জন্মেছে? ইহাদের যে যখন কার্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হবে, তখন তার উদ্যম দেখে লোকে অবাক হবে। এদের কাছে কাজ কি করে করতে হয়, তা শেখ। এই দেখ, আমার আদেশ পালন করতে ত্রিগুণাতীত সাধনভজন, ধ্যানধারণা পর্যন্ত ছেড়ে দিয়ে কার্যে নেমেছে। এ কি কম Sacrifice-এর কথা—আমার প্রতি কতটা ভালবাসা থেকে এ কর্মপ্রবৃত্তি এসেছে বল দেখি! Success করে তবে ছাড়বে!!''

লেখার অভ্যাস তাঁর ছিলই, কারণ তাঁর তিব্বত ভ্রমণকাহিনি Indian Mirror পত্রিকাতে ধারাবাহিক বেরত। আর একটি লেখা ওই পত্রিকাতেই প্রকাশিত হয়েছিল যার নাম—Swami Trigunatita's Lecture on the History and Philosophy of Famine. এই লেখাটি তাঁর ১৮৭৯ সালে দিনাজপুরের বিরোল গ্রামে দুর্ভিক্ষ-ত্রাণ কাজের অভিজ্ঞতাপ্রসূত। লেখাটি তাঁর চিন্তাশক্তি ও অভিজ্ঞতার ফসল যা বাস্তব সত্য ও তাঁর বিশ্লেষণী ক্ষমতার পরিচয় দেয়। অধ্যাপক শঙ্করীপ্রসাদ বসু মন্তব্য করেছেন : ''গোড়ায় দুর্ভিক্ষ সম্বন্ধে একাধিক ভ্রান্ত ধারণার দূরীকরণের চেষ্টা তিনি করেছিলেন। ঈশ্বরবিশ্বাসী তিনি, কিন্তু কুসংস্কারের প্রশ্রয় দিতে গররাজি। সেজন্য শাস্ত্রবচন বলে কথিত... দৈবনিগ্রহে দুর্ভিক্ষ হয়...

ঠিকমত যাগযজ্ঞ না করলে দুর্ভিক্ষ হয়... এইসব নির্বোধ ধারণাকে খণ্ডন করে... দুর্ভিক্ষের যথার্থ কারণ নির্ণয় করেছেন—যা রাজনৈতিক, ব্যবসায়িক, কৃষিগত এবং বৈজ্ঞানিক।" তাঁর ভবিষ্যৎ কর্মপ্রণালীর ভাবনা যে কত আধুনিক তা আমরা আজ বুঝি। লিখেছেন : ''আমরা এখনো শিখিনি কিভাবে আমাদের খাদ্যবস্তু উপযুক্ত উপায়ে উৎপাদন, সংগ্রহ এবং সংরক্ষণ করতে হয়—... জমির উন্নতিই আমাদের প্রথম মনোযোগের লক্ষ্য হওয়া উচিত—জমিই আমাদের প্রধান অন্নদাতা, আমাদের ধন-সম্পদের উৎস।... প্রথম শিক্ষা দিতে হবে কৃষিবিজ্ঞান, ভূমিবিজ্ঞান, শ্রম ও মূলধন-বিজ্ঞান...।"

উদ্বোধন পত্রিকায় তাঁর লেখার প্রসাদগুণ সবাইকে আকর্ষণ করত। পুজোর আগে তাঁর সম্পাদকীয় লেখাটি তাঁর ত্রিগুণাতীত বালক সত্তাকে মনে করিয়ে দেয়। লিখেছেন : ''আমাদের মাকে ভাল করে ঠাউরে ঠাউরে দেখেছেন? মার চোখ কত স্নেহে ভরা, জলে ছলছল; মা কত আনন্দে ভরা, কাছে দাঁড়াইলেই যেন শরীর মন হৃদয় সমস্ত এক অপরূপ আনন্দে পরিপূর্ণ হয়ে যায়।... শিশু গর্ভধারিণীকে 'মা' বলিয়া ডাকে; 'মা যে কি বস্তু' তা কি বুঝিয়া ডাকে? মা বলে ডাকতে হয়—ডাকে।" শুধু গম্ভীর আলোচনাই নয়, রম্যরচনাতেও সমান পারদর্শী তিনি। 'আড্ডা' নামে একটি অনবদ্য রচনা লিখেছেন যা আড্ডার শ্রেণিবিভাগ করে তাকে মর্যাদা দান করেছে। লেখার শেষে আশা প্রকাশ করেছেন : ''আড্ডার নাম শুনিলেই যেন সাধারণত লোকের মনে একটা ঘৃণাসূচক ভাব আসে। সে-ভাব যেন সকলকার মন হইতে দূরীকৃত হয়। আড্ডাসকল যেন আমাদিগের দেশের নেতৃমণ্ডলি-স্বরূপে পরিণত হয়, যেন পাড়ার আদর্শ-স্থান বলিয়া গণ্য হয়—এই প্রার্থনা।"

স্বামী তুরীয়ানন্দ পাশ্চাত্য থেকে চলে আসতে চান তাই স্বামীজী ত্রিগুণাতীত স্বামীকে তাঁর স্থলাভিষিক্ত করতে চাইলেন। তাঁর বিদ্যাবুদ্ধির ওপর স্বামীজীর আস্থা ছিল। তাঁর পড়াশোনা সম্পর্কে স্বামীজীর অনুজ মহেন্দ্রনাথ দত্ত লিখেছেন : ''নরেন্দ্রনাথের যখন পাথুরীর অসুখ হয়... তখন সারদা মহারাজ শুশ্রূষার জন্য আসিয়া থাকিতেন... বালক সারদা মহারাজ সম্মুখে বইখানি খুলিয়া রাখিয়া একমনে নরেন্দ্রনাথের নিকট শেক্সপীয়ারের কাব্যের সহিত সংস্কৃত কাব্যের কোথায় মিল ও কোথায় বৈষম্য আছে—সেই সমস্ত স্থির হইয়া বসিয়া শুনিতেন। শুনিতে শুনিতে সারদা মহারাজের মুখে ধ্যানের ভাব ফুটিয়া উঠিত... তিনি যখন বেদান্তশাস্ত্র অধ্যয়ন করিতেন, তখনও ঠিক এইরকম এক-মন-প্রাণ হইয়া পড়িতেন। বিকাল হইল, সূর্য অস্ত গেল, কিন্তু সারদা মহারাজের কোন হুঁশ থাকিত না।"

বিনা মেঘে বজ্রপাতের মতন স্বামীজীর হঠাৎ দেহত্যাগ হল। সব কাজকর্ম যেন স্তব্ধ হয়ে পড়ল কিছুদিনের জন্য। অতএব স্থগিত রইল কিছুদিন তাঁর পাশ্চাত্য যাওয়া। যাওয়ার আগে স্থির করে নিলেন, যদি দেশি খাবার না পাওয়া যায় তাহলে শুধু রুটি আর চিনি খেয়ে থাকবেন। সেদেশে পৌঁছে শুরু করলেন আরব্ধ কাজ। তাঁর বেদান্তব্যাখ্যা, সরল প্রেমপূর্ণ ব্যবহার অচিরেই সবাইকে আকর্ষণ করে নিল। তিনি নানা জায়গা থেকে বক্তৃতার আমন্ত্রণ পেতে লাগলেন। এখানেও একটি পত্রিকা প্রকাশ করতে থাকলেন—'Voice of Freedom'। একটি ব্রহ্মচারী শিক্ষণকেন্দ্র করলেন সেখানকার অনুরাগী যুবকদের নিয়ে। তাঁর জীবনে যা মূর্ত ছিল তাই তাদের বলতেন—"Live like a hermit and work like a horse."

সানফ্রান্সিসকো শহরে কাজ এত বৃদ্ধি পেল যে নিজস্ব একটি স্থান না হলে আর চলে না। তিনি নিজের উদ্যমে একটি হিন্দুমন্দির নির্মাণের পরিকল্পনা করলেন। তাঁর প্রতি বিশ্বাসে অনুরাগিবৃন্দ

প্রচুর অর্থব্যয়ে গড়ে তুললেন সে-মন্দির। তিনি বলতেন, ''বিশ্বাস কর, বিশ্বাস কর এই মন্দির-নির্মাণে আমার যদি এতটুকু স্বার্থ থাকে, তবে এ নষ্ট হয়ে যাবে, কিন্তু এ যদি ঠিক ঠিক ঠাকুরের কাজ হয়, তবেই টিকে থাকবে।'' ৭ জানুয়ারি ১৯০৬ মন্দিরের উৎসর্গভাষণে বললেন, ''এই ক্ষুদ্র স্থানটি ঈশ্বরের সেবায় উৎসর্গীকৃত। কোনও বিশেষ মানুষ, কোনও বিশেষ সমিতি, কোনও বিশেষ ধর্ম, কোনও বিশেষ সম্প্রদায়ের জন্য এই মন্দির উৎসর্গ করা হয়নি—সকল ধর্মের মানুষের জীবনচর্যার স্থান এটি।'' ঠাকুর বলতেন সরল ও উদার না হলে ঈশ্বরের কৃপা হয় না। তাঁর এই অপরিসীম উদারতা ও সারল্যই পাশ্চাত্যে তাঁর সাফল্যের চাবিকাঠি। তিনি সত্যে ছিলেন অনড়, তাই শত্রুতা ছিল না একথা বলা যাবে না। সে-শত্রুতাকে তিনি গ্রাহ্য করেননি। শেষ ক্লাসে তিনি তাঁর বিশ্বস্ত ছাত্র ধীরানন্দকে বলেছেন : ''সেই সময় একেবারে কাছে এসে গেছে যখন তোমাদের ভয়ানক পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হবে... কোনওমতেই নিজের ঘাঁটি ছেড়ে নড়বে না। তখন অপ্রত্যাশিত মহল থেকে সাহায্য আসবে—সর্বোপরি ঈশ্বর তোমাদের রক্ষা করবেন।''

জীবনের শেষপর্বে তিনি কেবল 'মা মা' করতেন। বহুদিন আগে মানস ও কৈলাসের পথে তিনি পিঠের বোঝা নামিয়ে পরিশ্রান্ত হয়ে বসেছিলেন। আর নড়বার ক্ষমতা ছিল না। ''রাত্রি ঘনাল—গভীর অন্ধকার কিন্তু নয়, তবে তীব্র ঠাণ্ডা।... পাহাড়গুলির ওপরে অনেক উঁচুতে মাথা তুলে আছে ধব্‌ধবে শিখরগুলি।... নিম্নে সবুজ পাহাড়ের গা বেয়ে নেমে এসেছে কত শুভ্র রেখা—সেগুলি পার্বত্য নির্ঝরিণীর ধারা—মনে হলো শুভ্র উপবীতধারী ব্রাহ্মণেরা বসে আছেন।... জলপ্রপাতের মধুর শব্দ ছাড়া আর কোন শব্দ নেই। কী গম্ভীর! ধ্যানে বসলাম। প্রভু রামকৃষ্ণ ও মহামাতার ধ্যান।... মুক্ত আকাশের নিচে কেটে গেল সারারাত্রি। জীবনের সবচেয়ে আনন্দের রাত্রি সেটি।'' যেন সেই দিনগুলির ডাক শুনতে পাচ্ছিলেন তিনি। অসুস্থ শরীরে, অসহ্য যন্ত্রণাকে সঙ্গে নিয়ে, কম্পিত কণ্ঠে বক্তৃতা দিতেন। সে-কম্পনের কারণ নিজেই বলেছেন, ''গলার কাঁপন নিয়ন্ত্রণ করবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেছি, যাতে তা শ্রোতাদের কানে না পৌঁছায়। কিন্তু ইদানীং যখন বক্তৃতামঞ্চে উঠি মহামায়া আমার সামনে এসে দাঁড়ান, এমনই স্নেহ-ভালবাসায় ভরিয়ে দেন যে, নিজেকে ঠিক রাখতে পারি না।''

মা তাঁকে ডেকে নিচ্ছিলেন, তবে তাঁর ওই নিষ্ঠুর মৃত্যু ভক্তদের প্রাণে আঘাত দেয় আজও। ক্রিসমাসের এক রবিবার যখন তিনি ভাষণ দিচ্ছিলেন তখন ভাবরা নামে এক মানসিক-ভারসাম্যহীন যুবক হঠাৎ বক্তৃতামঞ্চে বোমা ছোঁড়ে। সে নিজে সেখানেই প্রাণত্যাগ করে। ত্রিগুণাতীত স্বামী ছিটকে গিয়েছিলেন। মাথা বাদ দিয়ে সর্বশরীর ক্ষতবিক্ষত হয়ে যায় তাঁর। অসহ্য যন্ত্রণার মধ্যেও বলে উঠলেন, ''বেচারা ভাবরা, এইভাবে মরল! না, তার বিরুদ্ধে আমার কোনও অভিযোগ নেই।'' কদিনমাত্র বেঁচেছিলেন। স্বামীজীগতপ্রাণ স্বামীজীর ডাক শুনছিলেন। সে-বছর (১৯১৫) ১০ জানুয়ারি স্বামীজীর জন্মতিথি ছিল, দিনটি তাঁর দেহত্যাগের দিনও হয়ে রইল। ''মোর মরণে তোমার হবে জয়/ মোর জীবনে তোমার পরিচয়''—সার্থক হয়ে উঠল তাঁর জীবনে।

## সহায়ক গ্রন্থ

১। স্বামী গম্ভীরানন্দ, *শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তমালিকা* (উদ্বোধন কার্যালয় : *কলকাতা,২০০১)* ভাগ ২
২। *'উদ্বোধন'-এর প্রথম সম্পাদক স্বামী ত্রিগুণাতীত*—শঙ্করীপ্রসাদ বসু (সম্পাদক : স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ, *উদ্বোধন শতাব্দীজয়ন্তী নির্বাচিত সঙ্কলন,* উদ্বোধন কার্যালয় : ১৯৯৯)